বস্তুসার

(Abstract)

সাহিত্য সৃষ্টি লগ্ন থেকেই বিচিত্র রূপে পাঠকমহলকে প্রতিনিয়ত অভিভূত করে চলেছে। সে তার দেহে কালের ব্যবধানে ধারণ করেছে বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। বিশ্বপ্রকৃতির অপার রহস্য প্রতিটি শাখায় সৃজনশীল হাতে দিয়ে মুক্তি দিয়েছে নতুন বিষয়, নতুন ভাবনাকে। সময় ব্যতীত সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। সময়ের মন্থনেই শিল্পের জন্ম হয়। দেশকালের বাতাবরণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই মস্তিষ্কচালিত মানুষের ভাবনা, দর্শন এবং কর্মকাণ্ডে মননশীলতার প্রকাশ ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আদি সাহিত্য কাব্য তার পথে পেয়েছে গদ্য সাহিত্যের নানা রূপকে। একে একে এসেছে নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, অনুগল্পের মতো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তার পথ চলার ধারাবাহিকতায় বহু বিচিত্র নিদর্শন তৈরি করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যচর্চার বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য গদ্য সাহিত্যে পদার্পণ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা গদ্যচর্চার সার্থক সূত্রপাত হয়। গদ্যসাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্পের আস্বাদ আমরা পেতে শুরু করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে সার্থক বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব হয়। বাংলা সার্থক উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ঘটে সার্বিক মুক্তি। পরবর্তী সময়ে বহু ঔপন্যাসিকের কলমে উপন্যাস তার পথ চলতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্বপরিস্থিতির সংযুক্তি পর্বে কিন্নর রায়ের উপন্যাস জগতে আগমন। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ তাঁর সাহিত্যকে আলাদা মাত্র দান করেছে। ১৯৮১-২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্নর রায়ের প্রকাশিত তেইশটি উপন্যাসের মধ্যে আমি আমার আলোচনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন নিয়ে ‘পূর্ব’ পত্রিকা তাদের একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্নর রায়ের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। তবে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বহুমুখী জীবনসত্তা নিয়ে এপর্যন্ত গবেষণার কাজ হয়নি। আমার গবেষণার কাজটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে কিন্নর রায়ের স্থানটি নির্দেশ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায়

কিন্নর রায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

ব্যক্তিগত জীবন যে কোনো সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টির প্রধান রসদ। তাই সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে জানা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে কিন্নর রায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিচয় এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। কিন্নর রায় ১৯৫৩ সালের ৬ নভেম্বর কলকাতার চেতলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অমরনাথ রায় এবং মাতা গায়ত্রী রায়। বর্তমানে দুজনেই প্রয়াত। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন কেটেছে কলকাতাতেই। সক্রিয় রাজনীতি করার ফলে পড়াশুনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। অনেক সময়ের ব্যবধানে স্নাতক হন। 'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'প্রতিক্ষণ' বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে নানা সময়ে চাকরি করেছেন। জেল থেকে বেরোনর পর সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। হাতে লেখা কাগজে প্রথম গল্প লেখার সূচনা হলেও তার প্রামাণিক দলিল পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাছেই নরক' (১৯৮১ খ্রিঃ), প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রথযাত্রা' (১৯৮৭ খ্রিঃ)। কিন্নর রায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলির মধ্যে রয়েছে—'প্রকৃতিপাঠ', 'ধূলিচন্দন', 'মেঘপাতাল', আগুনের সিঁড়ি', 'সোনার মাছি', 'ছায়াতরু', 'সংশপ্তক', 'বিষকুম্ভ', 'ক্রুশবন্দি', 'মৃত্যুকুসুম', 'পতনের পর', 'রেডকরিডরের জানালা', 'সোনার মাছি', 'শ্রীচৈতন্যকথা' প্রভৃতি। এছাড়া 'রথযাত্রা', 'ধর্মসংকট', 'তুলসিচরিতমানস', 'হুজুরের ঘোড়া' প্রভৃতি গল্প সংকলন এবং লুপ্তজীবিকা', 'ভাঙা বন্দুকের গান', 'কলকাতা কল্পনালতা', 'বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ' প্রভৃতি তথ্যমূলক রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য রচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন সব মিলিয়ে প্রায় একশোটির মত গ্রন্থ রচনা করেন। একাধিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, সোপান পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং কয়েক বছর আগে বঙ্কিম পুরস্কার পান। বিপুল সম্ভার নিয়ে সাহিত্য জগতে কিন্নর রায় নিজের আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্নর রায়ের উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ

কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় বিশ শতকের সত্তর দশকের শেষ লগ্নে সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করলেও তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রকৃতি পাঠ' (১৯৯০ খ্রিঃ)-এর মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সাহিত্যিক হলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। কোভিড-১৯ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তা ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় ত্রিশ বছর আগে আমাদের শেখানোর চেষ্টা করেছেন। যখন 'প্রকৃতিচিন্তা', 'দূষণ', 'প্রকৃতি ধ্বংস' ইত্যাদি নিয়ে সেভাবে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে লেখা 'প্রকৃতি পাঠ'-এর মত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একক লড়াই বললেই চলে। তরুণ সেনগুপ্তের উৎসাহে কিন্নর রায় ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'সত্যযুগ' পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে দে'জ পাবলিকেশন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'প্রকৃতি পাঠ' নামে। শুধু বাংলায় কেন, কোনো ভারতীয় ভাষায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি বলে অনেকে মনে করেন। 'প্রকৃতি পাঠ' উপনাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে চিঠি লিখেছিলেন পরে তা বহুল প্রচলিত আনন্দবাজার সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাসের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের তুলনা করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন 'আরণ্যক' উপন্যাসকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম পরিবেশ চিন্তামূলক উপন্যাস। তাঁর সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতিচেতনা, ধর্মচিন্তা, রাজনীতিকেন্দ্রিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে রচনার বিষয়বস্তু অবয়ব সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে উপন্যাসের অধ্যায় নির্মাণ করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্নর রায়ের প্রকৃতিচেতনামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

সম্প্রতি পরিবেশের সংকটজনক অবস্থা মানব সভ্যতার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সময়ের বাঁক বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রমাণ মানব সভ্যতা পেয়েছে বহুবার বহুভাবে।

আসলে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার অর্থ মানব জীবনের বিপন্নতা। ফলে পরিবেশ দূষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা সমগ্র মহলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবেশ প্রেমিকদের মতই বাদ যাননি সাহিত্য প্রেমিকরাও। সাহিত্যের বহু শাখায় পরিবেশ সংকট নিয়ে চিন্তার রূপ বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সময়ে। তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা। বাদ যায়নি বাংলা সাহিত্যও। পরিবেশবাদী ভাবনা ফুটে উঠেছে বাংলা উপন্যাসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার সূচনা করেন। তবে নব্বই-এর দশকে কিন্নর রায়ের হাত ধরে পরিবেশবাদী উপন্যাসের পরিপূর্ণ পথ চলা শুরু হয়। তাঁর 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসে প্রকৃতি পটভূমি না হয়ে বিষয় হয়ে উঠেছে। কলকাতার পরিবেশের বিপন্নতার স্বরূপ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আমাদের এই প্রিয় শহরটিকে দূষণ দিনে দিনে কতটা নষ্ট করে ফেলেছি তার দলিল 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯০ খ্রিঃ)। 'মৃত্যুকুসুম' (২০০৭ খ্রিঃ) উপন্যাসেও দেখা যায় আংশিক প্রকৃতি বিপন্নতার চিত্র। উপন্যাসের পটভূমিতে কাল্পনিক মায়াজালে কথা বলেছে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের বুঁজে যাওয়া জলাভূমির বুক ফুঁড়ে জেগে ওঠা মায়াবৃক্ষ, শুক-শারি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিরা। 'মেঘপাতাল' (১৯৯৫ খ্রিঃ), 'ধূলিচন্দন' (২০০৫ খ্রিঃ), 'ব্রহ্মকমল' (২০০৯ খ্রিঃ), 'হননঋতু' (২০১০ খ্রিঃ) উপন্যাস ছাড়াও অনেক উপন্যাসে প্রকৃতিচেতনার রূপ ধরা পড়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কিন্নর রায়ের ধর্মচিন্তামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

ধর্ম মানুষের চিত্তের শুদ্ধি ঘটায়। সেইসঙ্গে ধর্ম আমাদের নীতিশিক্ষারও পাঠ দেয়। দীর্ঘকাল থেকেই সমাজ বিশ্লেষকেরা ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মর্মে উপনীত হয়েছেন যে ধর্ম-বিশ্বাস মূলত ব্যক্তিমানুষকে নিষ্ঠাবান হতে শেখায়। সেই নিষ্ঠা ইহলৌকিক বিষয়বস্তু নয়। তা অতিলৌকিক সর্বশক্তিমান এক পরম অস্তিত্ব। তবে তা হতে পারে আকারযুক্ত বা নিরাকার উভয়ই হতে পারে। আসলে এ ধরণের বিশ্বাসের মূল কারণই হল মানুষের বিশ্বজগতের রহস্য উন্মোচনের অনিচ্ছা। অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতিকে জানার ইচ্ছা থেকেই জন্ম হয়েছে বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ধর্মের প্রভাব কিন্তু শিথিল হয়ে যায়নি। আসলে ধর্ম সমাজকাঠামোর প্রতিটি অঙ্গে মিশে গিয়ে সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। ফলে ধর্ম-

বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বহু প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম মানবজীবনে ও সমাজ পরিবেশে এমনকি রাজনৈতিক অবস্থান নির্মাণেরও হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কালের প্রবহমানতায়। বাংলা উপন্যাসে ধর্মভাবনার প্রসঙ্গ এযাবৎ বহু ঔপন্যাসিকের হাতে রূপ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় বাদ যাননি এ ধারার উপন্যাস চিন্তায়। তিনি বহু ধর্মীয় স্থান ঘুরে এবং বহু ধর্মমূলক বই পাঠ করে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের রূপকে, তার বিস্তারকে এবং বহু জায়গায় তার প্রভাবকে বিচার করার চেষ্ঠা করেছেন। 'পূর্ণযাত্রা' (১৯৯৭ খ্রিঃ) উপন্যাসে পুণ্যলোভী, হুজুগপ্রিয়, সংস্কারময়, আত্মপীড়ন তাড়িত মানুষের উপস্থিতি কীভাবে কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তারই চিত্র এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তাঁর ধর্মচিন্তা বিষয়ক অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল- 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২ খ্রিঃ), 'জাদু চিরাগের রাতদিন' (২০০৩ খ্রিঃ), 'তুষিত স্বর্গের আলো' (২০০৫ খ্রিঃ), 'সংশপ্তক' (২০১২ খ্রিঃ), 'শ্রীচৈতন্যকথা' (২০১৮ খ্রিঃ) প্রভৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়

কিন্নর রায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

রাজনৈতিক বিষয় উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম পর্ব থেকেই স্থান করে নিয়েছে। উপন্যাসজগতে মূল পটভূমি থেকে শুরু করে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনীতির যত্রতত্র প্রবেশ। বাংলা সাহিত্যের এযাবৎ বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আশির দশকে উঠে আসা ঔপন্যাসিক কিন্নর রায়ের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর। কারণ যৌবনকাল থেকেই তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যোগসাধন করে চলেছেন। শুধু তাই নয় নকশালবাড়ি আন্দোলনে সরাসরি যোগদান, প্রশাসনিক আমলাদের অত্যাচার, জেলবন্দি হওয়া তাঁকে উপন্যাস রচনার রসদ জুগিয়েছে। জেলজীবন থেকে বেরিয়ে এসেও ভুলে যাননি পূর্ববর্তী আন্দোলনকারী সত্তাকে। তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক চিত্র বদলের চেহারাকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিতে নেমে পড়লেন। অবশ্য প্রথম উপন্যাস 'কাছেই নরক' জেলজীবনের অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর বিষোদ্গার ধরা পড়েছে বিস্তারিত রূপে। একদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্যদিকে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বহু বই পড়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে জ্ঞান ভাণ্ডারের অপরিসীম উৎস। ফলে তাঁর উপন্যাস মধ্যে সেই

ধারাবিবরণীর চিত্রের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করাতে পিছপা হননি কিন্নর রায়। কিন্নর রায় ‘পতনের পর’ (২০১২ খ্রিঃ) উপন্যাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পশ্চিমবঙ্গে সমাজতন্ত্রের পতনকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যুমগ্ন সময় ও মহাসময়ের এই ধারাবাহিক ছবির সঙ্গে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির নানা জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে তাঁর কাহিনি বয়নে। এছাড়া ‘ধূলিচন্দন’ (২০০৫ খ্রিঃ), ‘মৃত্যুকুসুম’ (২০০৭ খ্রিঃ), ‘ব্রহ্মকমল’ (২০০৯ খ্রিঃ), ‘হননঋতু’ (২০১০ খ্রিঃ), ‘অন্ধ কোকিলের গান’ (২০১১ খ্রিঃ), ‘রেডকরিডরের জানালা’ (২০১৩ খ্রিঃ) ‘সোনার মাছি’ (২০১৪ খ্রিঃ), প্রভৃতি উপন্যাসে রাজনৈতিক চালচিত্রের ছায়া ধরা পড়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিন্নর রায়ের আর্থ-সামাজিক ভাবনামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাই সাহিত্যের মধ্যে মানব জীবনেতিহাসের প্রতিটি চিত্র সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। একসময় অর্থের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর দেশের মেরুদণ্ড নির্ভর করে। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সমাজ সংগঠকেরা গ্রামীণসমাজ ও অর্থব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ‘পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা’ নাম দিয়ে উন্নয়নের খসড়া গঠিত হয়। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরের উন্নয়নে নজর দিতে গিয়ে শিক্ষা, নারী ও শিশুকল্যানমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের দাপটে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। সেই প্রভাব থেকে বাদ যায়নি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বিবর্তনও। পুঁজিবাদী দেশের আগ্রাসী নীতির কবলে মানুষ প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছে। আর বহুল প্রচলিত ‘গ্লোবালাইজেশন’ এর মতো বিষয় মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সেখানে বাদ পড়ে না পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের গ্রাম্য জনজীবনও। আবার রাজনৈতিক পালাবদলের দ্বারাও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চিহ্নিত হয়। কিন্নর রায়ের উপন্যাসেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র

উঠে এসেছে। তাঁর 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২ খ্রিঃ), 'স্বপ্নপুরাণ' (২০০০ খ্রিঃ), 'অগ্নিপুরুষ' (২০০২ খ্রিঃ) প্রভৃতি উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র উঠে এসেছে।

উপসংহার

সাহিত্যিক কিন্নর রায় চলমান সমাজের সাধারণ চরিত্রদের নিয়ে কাহিনি বুনেছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা হুবহু তুলে না ধরে কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। যা আমাদের তৎকালীন পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছে। সাম্প্রদায়িকতার চিত্রের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধর্মের মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। বিশ্বায়নের প্রভাব কিংবা বদলে যাওয়া সময়ের চিত্র তাঁর উপন্যাসের অঙ্গ হয়ে দেখা দেয়। সর্বোপরি তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি চিন্তার সর্বত্র বিচরণ লক্ষ করা যায়। উপন্যাস সাহিত্যে তিনি এক আলাদা মাত্রা যুক্ত করেছেন। তাঁর লেখনী এখনও চলমান। ফলে সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।